ইউনিট ১
অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি

ইউনিট ১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি

প্রত্যেকটি সমাজের উৎপাদনকারীকে দৈনন্দিন জীবনে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কী কী দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে এসব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হবে, এবং কারা এবং কীভাবে এসব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ভোগ করবে। এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা অর্থনীতিশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হয়। বিশেষ করে, কৃষি প্রধান দেশের জন্য কোন্ জাতের ফসল, মাছ বা গবাদি পশু কোন্ পদ্ধতিতে উৎপাদন করলে কৃষকের লাভ বাড়বে বা পারিবারিক ভোগের চাহিদা মিটবে বা তৃপ্তি সর্বাধিক হবে - কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করলে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। এ ইউনিটের পাঠ শেষে, অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু, জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা, জমির মালিকানা ও খামার আয়তন এবং বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও ভূমিসংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

পাঠ ১.১ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির সংজ্ঞা, পরিধি ও পার্থক্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও পরিধি এবং এ দুটো বিষয়ের মাঝে সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে জমির মালিকানা, খামারের গড় আয়তন, জমির খন্ডায়ন ও বিভাজন এবং কৃষকের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

অর্থনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা

অর্থনীতি শাস্ত্রের সর্ব প্রথম সংজ্ঞাটি দেন এ্যাডাম স্মীথ। তাঁর মতে, "অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।" তাঁর মতে, সম্পদ আহরণই হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কার্যাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দিক থেকে সংজ্ঞাটি অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুকে অনেকটা সংকুচিত করে ফেলে। লর্ড কীন্স এর ভাষায়, "অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের ব্যবহার এবং সমাজবদ্ধ মানুষের আয় ও নিয়োগ ব্যবস্থার আলোচনা।"

অর্থনীতিশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক এল. রবিন্স। তাঁর সংজ্ঞানুসারে, "অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ সম্পর্কিত মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীর আলোচনা করে। এ সংজ্ঞাটি মানব জীবনের তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

- মানব গোষ্ঠীর রয়েছে অসীম অভাব,
- অসীম অভাবগুলো পূরণের জন্য যে সম্পদ রয়েছে তা দুষ্প্রাপ্য ও সীমিত, এবং
- এসব দুষ্প্রাপ্য ও সীমাবদ্ধ সম্পদগুলোর রয়েছে বিকল্প ব্যবহার।

সমাজবদ্ধ মানুষ কীভাবে তাদের অসংখ্য অভাব ও লক্ষ্যগুলোকে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বা উপকরণগুলো দ্বারা পূরণের বা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাই হচ্ছে অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু।

মোট কথা, সমাজবদ্ধ মানুষ কীভাবে তাদের অসংখ্য অভাব ও লক্ষ্যগুলোকে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বা উপকরণগুলো দ্বারা পূরণের বা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাই হচ্ছে অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু। যেহেতু অর্থনীতি সমাজবদ্ধ মানুষ নিয়ে আলোচনা করে সেহেতু এ বিষয়টিকে একটি সমাজ বিজ্ঞান বলা হয়।

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষি খাতের সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধানে অর্থনীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে। অধ্যাপক ওয়েন ম্যাকার্থি প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে, "কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা কৃষি খাতের যে কোনো দিকের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে এমন সব বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য ও সীমিত উপকরণসমূহ দ্বারা মানুষের বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণসম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী আলোচনা করে।" কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্র হচ্ছে অর্থনীতির তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কীভাবে কৃষিখাতে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদসমূহ দ্বারা বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

বিষয়বস্তু ঃ কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

- কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সম্পদের মালিকানা ও বন্টন (ভূমি, শ্রম, মূলধন, ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি)।
- কৃষি পণ্য ও উপকরণ সমূহের চাহিদা যোগান, পরিবহণ, প্রক্রিয়াণ্বিতকরণ ও বিপণন।
- সরকারী নীতিমালা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদন ও তার ভোগকে প্রভাবিত করে।
- কৃষি খাতের সাথে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের সম্পর্ক এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর কৃষি খাতের প্রভাব।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন-সমবায়, ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক, সেচ গ্রুপ, বিপণন সংস্থা, ইত্যাদি।

অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের পরিধি ও পার্থক্য

কৃষি অর্থনীতিও একটি সমাজবিজ্ঞান। কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, ব্যবসায়ী, যোগানদাতা সকলেই কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

অর্থনীতি	কৃষি অর্থনীতি
• অর্থনীতি একটি সমাজিক বিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ সকল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।	• কৃষি অর্থনীতিও একটি সমাজবিজ্ঞান। কৃষিখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, ব্যবসায়ী, যোগানদাতা সকলেই কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।
• অর্থনীতিশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যেমন- অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে।	• কৃষি অর্থনীতি কৃষির বিভিন্ন খাত যেমন- শস্য, মাৎস্য, গবাদিপশু, বনায়ন ইত্যাদি খাতে নিয়োজিত মানুষের অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে।
• সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে মানুষের অসীম অভাবকে পূরণ করা যায় তাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।	• কৃষির জন্য প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বাড়ানো যায় তাই কৃষি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
• অর্থনীতিশাস্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় ও সমাধান বের করতে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ শৃংখলাবদ্ধভাবে ব্যবহার ও পরিবেশন করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।	• কৃষি অর্থনীতি একটি আধুনিক প্রায়োগিক বিজ্ঞান, যা কৃষি সম্পদের ব্যবহার, উপকরণ বন্টন, ঋণদান, ভর্তুকি, পণ্যমূল্য ও বিপণন, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা বাতলে দেয়।
• অর্থনীতিশাস্ত্র একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে নিরপেক্ষভাবে কেবল অর্থনীতির সমস্যাগুলোই বিচার বিশ্লেষণ করেনা, একটি কল্যাণকর নীতিবিজ্ঞান হিসাবে তা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানসমূহেরও ইঙ্গিত দেয়।	• কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে কেবল তথ্য সহকারে বিশ্লেষণই করেনা, কৃষি উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে কেবল তথ্য সহকারে বিশ্লেষণই করেনা, কৃষি উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

কৃষি অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

কৃষি অর্থনীতি বিষয় পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কৃষিখাতে যেসব অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তার বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ ও সমাধান বাতলে দেয়া। এর থেকে জানা যায়,

ক. কী ধরনের ও কী পরিমাণে কৃষি পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে,
খ. কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোন্ উপকরণ কী পরিমাণে ব্যবহার করলে লাভ সর্বাধিক হবে এবং
গ. উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কীভাবে ভোক্তাদের মাঝে বন্টিত হবে।

কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য প্রধান প্রধান কতকগুলো শাখায় পাঠ নিতে হয়। যেমন, খামার পর্যায়ে উৎপাদনের লাভক্ষতি নিরূপণের জন্য কৃষি উৎপাদন অর্থনীতি ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে হয়। কৃষি পণ্যের দাম ও বিপণন সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য কৃষি মূল্য ও বিপণন বিষয়ে পাঠ করতে হয়। কৃষি অর্থ-সংস্থান ও মূলধন সংগঠন বিষয়গুলো খামার পর্যায়ে মূলধন সংগঠন ও ঋণদান ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডের ওপর ধারণা পাবার জন্য কৃষি সমবায় ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান বিষয় পাঠ করতে হয়।

মোটকথা, কৃষি অর্থনীতি একটি সমন্বিত সমাজ বিজ্ঞান, যার মধ্যে মূল অর্থনীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও ভোগের অর্থনৈতিক দিকে অনেকগুলো প্রায়োগিক বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে।

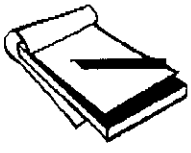

অনুশীলন (Activity) : আপনার মতে অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? যদি থেকে থাকে তবে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

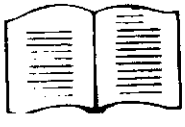

সারমর্ম ঃ অর্থনীতিশাস্ত্র হচ্ছে এমন একটি সমাজবিজ্ঞান যা বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদ দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী আলোচনা করে। এর প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে : (১) মানুষের অভাব অসীম; (২) অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্ত সম্পদ সসীম ও দুষ্প্রাপ্য; এবং (৩) সম্পদগুলো বিকল্প ব্যবহার যোগ্য। অপরদিকে, কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের মূল কথা হচ্ছে কীভাবে অর্থনীতিশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে কৃষিখাতে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বা উপকরণ দ্বারা বিকল্প লক্ষ্যসমূহ পূরণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

ক. প্রত্যেক সমাজের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে--
- i. কী কী দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হবে
- ii. কীভাবে এগুলো উৎপাদন করা হবে
- iii. কার এবং কীভাবে এগুলো ভোগ করবে
- iv. উপরের সবগুলো।

খ. কোন্‌টি অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল উপাদান নয়?
- i. মানুষের অভাব অসীম
- ii. সম্পদ সীমিত
- iii. সম্পদসমূহ ব্যয়বহুল
- iv. সীমিত সম্পদগুলোর বিকল্প ব্যবহার রয়েছে।

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতির মধ্যে মূলত: কোনো পার্থক্য নেই।

খ. কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র কৃষিখাতের সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করে এবং যথোপযুক্ত কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয় হচ্ছে ..... সম্পদের ব্যবহার।

খ. কৃষি অর্থনীতি একটি আধুনিক ..... বিজ্ঞান।

৪। একবাক্যে বা কথায় উত্তর দিন।

ক. কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের মূল কথা কী?

খ. কৃষি অর্থনীতিশাস্ত্র পাঠ করলে কী জানা যায়?

পাঠ ১.২ জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কৃষি ও কৃষি খাত বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- কৃষি প্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষি কোন্ খাতে কীভাবে কতটুকু অবদান রাখে তাও বুঝতে পারবেন।
- উন্নত প্রযুক্তি প্রসার লাভ করলে কৃষির অবদান বাড়ার সম্ভাবনা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কৃষি ও কৃষিখাত

কৃষি বলতে একসময় কেবল জমি চাষ করে তাতে ফসল উৎপাদন করা বোঝাত। আধুনিক কালে কৃষি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। এর মধ্যে পড়ে শস্য উপখাতসহ সকল প্রকার উপখাতসমূহ যেমন, মাৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাস মুরগী পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, রেশম চাষ, মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন, গৃহাঙ্গনে সব্জি ও ফুলের চাষ, ইত্যাদি। কৃষি এখন বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। বর্তমানে কৃষি এক গতিশীল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডও বটে।

কৃষিখাত বলতে কেবল উপরিবর্ণিত কৃষি উৎপাদনের উপখাতগুলোকেই বোঝায় না। কৃষি উপকরণ সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ঋণ ব্যবস্থা, কৃষি পণ্যের বিপণন ও পরিবহণ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা, কৃষি সমবায় ইত্যাদি সেবাগুলোও কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে ব্যাপক অর্থে কৃষি সেবা খাত বলে অভিহিত করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা

বাংলাদেশের মত একটি কৃষি প্রধান দেশে কৃষির ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। এদেশের প্রায় ১৩ কোটি জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বসবাস করে, যারা জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক পেশার ওপর নির্ভরশীল। কৃষি প্রধানত: কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে তা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. কৃষি খাদ্যের যোগান দেয় ঃ

কৃষি একটি দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য সকল প্রকার খাদ্যের যোগান দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬/৯৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষের জন্য মাথাপিছু ১৬ আউন্স হিসাবে মোট ২ কোটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ছিল। ঐবছর কৃষিখাত উৎপাদন করেছে মোট ২ কোটি ৪ লাখ টন খাদ্যশস্য, যার মধ্যে প্রধানত: চাল ও গম রয়েছে। খাদ্যশস্যের এই যোগান ছাড়াও কৃষি খাত প্রতিবছর প্রায় ১৪ লক্ষ টন মাছ, প্রায় ১৪ লক্ষ টন দুধ, ৫ লক্ষ টন মাংস এবং প্রায় ২৫৪ কোটি ডিম উৎপাদন করছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো অত্যন্ত কম। কৃষি এসব খাদ্যের যোগান দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে কেবল বাঁচিয়ে রাখে তাই নয়, পরোক্ষভাবেও খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা দিয়ে মানুষের শ্রমশক্তি ও কর্মক্ষমতা টিকিয়ে রাখছে। এটিই কৃষির সবচেয়ে বড় ও মৌলিক অবদান।

২. কৃষি শিল্পে কাঁচা মালের যোগান দেয় ঃ

কৃষি শিল্প উৎপাদনের জন্য কলকারখানায় কাঁচামাল যেমন- পাট, তুলা, চামড়া, কাঠ ইত্যাদি যোগান দেয়। কৃষি থেকে কাঁচামাল হিসাবে যে তুলা সরবরাহ করা হয় তা থেকেই তৈরি হয় আমাদের বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ। এভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে উৎপাদন যোগসূত্র গড়ে উঠে। মোটকথা, কৃষির উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে একটি দেশের শিল্পায়ন নির্ভর করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয়া হয়। শিল্পায়ন ও নগর উন্নয়নের ফলে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়।

৩. কৃষি অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয় ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি থেকে অন্যান্য খাতে শ্রমের যোগান দেয়া হয়। শিল্পায়ন ও নগর উন্নয়নের ফলে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়। ফলে, কৃষিখাত থেকে দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিক শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। এতে নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠে। রাস্তাঘাট ও দালান কোঠা নির্মাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতেও গ্রামাঞ্চল হতে শ্রমিকের যোগান দেয়া হয়।

৪. কৃষি মূলধনের যোগান দেয় ঃ

কৃষিখাত থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূলধন অকৃষি খাতে যোগান দেয়া হয়। সাধারণত: ভূমিরাজস্ব, কৃষি-কর ব্যবস্থা, কৃষি মূল্যনীতি, কৃষি পণ্যমূল্যের সাথে শিল্প পণ্যমূল্যের বৈষম্য, ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত আয় অকৃষি খাতে চলে যায় ও বিনিয়োগ হয়।

৫. কৃষিখাত শিল্প পণ্য সামগ্রীর বিশাল বাজার হিসাবে কাজ করে ঃ

কৃষি খাতে নিয়োজিত বিশাল জনগোষ্ঠী শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী যেমন- পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র ইত্যাদি ভোগ্য দ্রব্য এবং সার, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে। ফলে এগুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদনও বেড়ে যায়। অপর দিকে, কৃষকরা অকৃষিখাতের ভোক্তাদের কাছে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে, যার ফলে এসবের বাজার সম্প্রসারিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

৬. কৃষি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে ঃ

উন্নয়নশীল দেশে কৃষি পণ্য রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান উপায়। উন্নত দেশে কাঁচামাল যেমন, পাট, তুলা, চামড়া, ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এ ছাড়াও চা, চিনি, মাছ ইত্যাদি রপ্তানি করেও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩২ ভাগ আসে কৃষি থেকে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ-বছরে কেবল মাত্র পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে ।

৭. কৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ঃ

কৃষি হচ্ছে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারখানা। বাংলাদেশে মোট জনশক্তির শতকরা ৬৬ ভাগের কর্ম সংস্থান হয় কৃষিতে। একমাত্র মাৎস্য খাতেই প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। সেচ-সার প্রযুক্তির প্রসার ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের আবাদ বিস্তার লাভ করায় কৃষিতে বিপুল কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়াও আধুনিক পদ্ধতির মাৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাস মুরগী পালন, কৃষি উপকরণ ও পণ্য বাজার জাতকরণ ও পরিবহণ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করায় গ্রামাঞ্চলে বহু বেকার যুবকের স্বকর্ম-সংস্থান হচ্ছে।

কৃষি হচ্ছে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারখানা। বাংলাদেশে মোট জনশক্তির শতকরা ৬৬ ভাগের কর্ম সংস্থান হয় কৃষিতে।

৮. কৃষি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটি বিরাট উৎস্য হচ্ছে কৃষি খাত। সাম্প্রতিককালে এদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জি.ডি.পি.) ১৮ শতাংশ আসে শস্য খাত থেকে, ৫ শতাংশ মাৎস্য খাত থেকে, ৪ শতাংশ গবাদিপশু ও ৩ শতাংশ বনায়ন খাত থেকে আসে। কৃষিতে আরও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বাড়বে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতেও এ খাত আরও অবদান রাখতে পারবে।

অনুশীলন (Activity) : কীভাবে কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে তা বর্ণনা করুন।

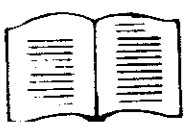

সারমর্ম ঃ কৃষি বলতে কেবল শস্য উৎপাদন করা বোঝায়না, কৃষির সকল উপ-খাত যেমন শস্য, মাৎস্য, গবাদিপশু, বনায়ন, ফুলের চাষ ইত্যাদিকেও বোঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। কৃষি খাদ্য, বস্ত্র, শ্রম ও মূলধনের যোগান দেয়। কৃষি শ্রমিকের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করে। কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানি করে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। এ জন্য কৃষি উন্নয়নের ওপর জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. কৃষির প্রত্যক্ষ অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–
- i. কৃষিখাত শিল্পপণ্যের বাজার সৃষ্টি করে
- ii. কৃষি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
- iii. কৃষি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের যোগান দেয়
- iv. কৃষি মূলধনের যোগান দেয়

খ. বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজন–
- i. ২ কোটি ৪ লক্ষ টন।
- ii. ২ কোটি ৫ লক্ষ টন।
- iii. ২ কোটি ১৫ লক্ষ টন।
- iv. ২ কোটি ২৫ লক্ষ টন।

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. কৃষিখাত বলতে শুধু কৃষিজদ্রব্য উৎপাদনকেই বুঝায়।

খ. কৃষি উন্নয়নের উপর জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. বাংলাদেশের জি.ডি.পি. এর _____ শতাংশ আসে শস্যখাত থেকে, _____ শতাংশ আসে মাৎস্য খাত থেকে, _____ শতাংশ আসে গবাদিপশু খাত থেকে, এবং _____ শতাংশ আসে বনায়ন খাত থেকে।

খ. কৃষির প্রধান প্রধান উপখাতগুলো হচ্ছে
_____, _____, _____, _____।

৪। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. কৃষিশিল্প উৎপাদনের জন্য কলকারখানায় কী কী কাঁচামাল যোগান দেয়?

খ. কৃষিখাতে কী পরিমাণ জনশক্তির কর্মসংস্থান হয়।

পাঠ ১.৩ জমির মালিকানা, খামারের আয়তন ও কৃষকের শ্রেণিবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জমির মালিকানায় অসম বন্টন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- খামারের আয়তন ও খন্ডায়ন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক লিখতে পারবেন।
- কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

জমির মালিকানা

বাংলাদেশে মোট ২ কোটি ২৩ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুয়ায়ী দেশে গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ, যাদের মধ্যে ২০ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবারের (১২%) কোনো জমি নেই। ৬০ লক্ষ ৪৭ হাজার পরিবারের (৩৪%) জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের কম। এই হিসাবে, বাংলাদেশে কার্যত: ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার, অর্থাৎ মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৪৬ ভাগই কার্যত ভূমিহীন।

বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬৩ ভাগ।

বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার, যা মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৬৩ ভাগ। জমির মালিকানা ও জমির আবাদ উভয়ক্ষেত্রেই একটি অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান। যেমন- ১৯৮৩/৮৪সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী নিচের সারণি ১.১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষক পরিবারগুলোর শতকরা ৭০ ভাগই ছোট কৃষক, যাদের খামারের গড় আয়তন ২.৫ একরের কম, অথচ এদের মালিকানায় আছে মাত্র ৩১.৭% জমি। অপরদিকে, মাত্র ৫ শতাংশ কৃষক হচ্ছে বড় কৃষক (যাদের খামারের গড় আয়তন ৭.৫ একরের বেশি) অথচ এদের মালিকানায় আছে প্রায় শতকরা ২৬ ভাগ জমি। বাকি ২৫ ভাগ হচ্ছে মাঝারি কৃষক (যাদের খামারের গড় আয়তন ২.৫-৭.৫ একরের মধ্যে) এবং মালিকানায় আছে প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ জমি।

সারণি ১.১ : বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা এবং তাদের মালিকানাধীন ও আবাদী জমির বন্টন, ১৯৮৩/৮৪

খামার আয়তন (একর)	কৃষকের সংখ্যা (হাজার)	%	মালিকানাধীন জমি (হাজার একর)	%	আবাদী জমি (হাজার একর)	%
ছোট খামার (২.৪৯ একরের কম)	৭০৬৬	৭০.৩	৬৮৮৬	৩১.৭	৬৫৭৩	২৯.০
মাঝারী খামার (২.৫০-৭.৫০ একর)	২৪৮৩	২৪.৮	৯২৭২	৪২.৭	১০২২৬	৪৫.১
বড় খামার (৭.৫০ একরের বেশি)	৪৯৬	৪.৯	৫৫৭১	২৫.৬	৫৮৭৯	২৫.৯
মোট	১০০৪৫	১০০.০	২১৭২৯	১০০.০	২২৬৭৮	১০০.০

খামারের আয়তন ও জমির খন্ডায়ন

গড় আবাদী জমির পরিমাণ ছোট কৃষকদের বেলায় মাত্র ০.৯ একর, মাঝারি কৃষকের বেলায় ৪.১ একর এবং বড় কৃষকের বেলায় ১১.৯ একর।

উপরের সারণিতে আমরা দেখেছি যে ছোট কৃষকরা সংখ্যায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হলেও তারা আবাদ করে এক-তৃতীয়াংশেরও অনেক কম জমি। অপরদিকে, মাঝারি ও বড় কৃষকরা তাদের সংখ্যার তুলনায় আবাদ করে অনেক বেশি জমি। এর অর্থ হচ্ছে এই যে গড় আবাদী জমির পরিমাণ ছোট কৃষকদের বেলায় মাত্র ০.৯ একর, মাঝারি কৃষকের বেলায় ৪.১ একর এবং বড় কৃষকের বেলায় ১১.৯ একর। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বাংলাদেশে দিন যত যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষক পরিবারের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, ১৯৮৩/৮৪ সালে

যেখানে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৫ হাজার, ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজারে। এর ফলে, কৃষি খামারগুলোর গড় আয়তন দ্রুত কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে যেখানে খামারের গড় আয়তন ছিল ৩.৫ একর, ১৯৮৩/৮৪ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২.৩ একর এবং ১৯৯৬ সালে কৃষি শুমারী অনুযায়ী তা আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.০২ একরে।

ছোট ছোট প্লট হওয়ায় কলের লাঙ্গলে জমি চাষ ও সকল জমিতে সমানভাবে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যনীয়। কেবল খামারের গড় আয়তন কমে যাচ্ছে তাই নয়, জন সংখ্যার চাপে জমিগুলো খন্ড বিখন্ড হয়ে ছোট ছোট প্লটে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ১৯৮১ সালের তথ্য অনুযায়ী একেকটি প্লটের গড় আয়তন ছিল ০.৩৫ একর। বর্তমানে প্লটের আয়তন আরও ছোট হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। খামার প্রতি গড়ে প্রায় ৮-১০ টি প্লট আছে এবং প্লটগুলো আবার আইল দ্বারা বেষ্টিত। এক হিসাবে দেখা যায় যে কেবল আইলেই ৫ লক্ষ একর জমি চলে গেছে। ছোট ছোট প্লট হওয়ায় কলের লাঙ্গলে জমি চাষ ও সকল জমিতে সমানভাবে সেচ দেয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও এখানে সেখানে খন্ড বিখন্ড জমি থাকার দরুন সব জমিতে সময়মত ফসল বোনা, পরিচর্যা ও তত্বাবধান করায় অসুবিধা হয়।

খামারের আয়তনের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে খামারের আয়তনের সঙ্গে উৎপাদনের একটি ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, খামারের আয়তন বাড়ার সাথে সাথে একর প্রতি উৎপাদন কমে যায়। সাধারণত ছোট কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদন বড় কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়। তবে, অতি ছোট কৃষকদের বেলায় উৎপাদন কিন্তু কম হয়। প্রধানত: মূলধনের অভাবে সময়মত চাষ, বীজ, সার প্রয়োগ করতে না পারার কারণে। মাঝারি কৃষকদের একরপ্রতি ফলন সাধরণত ছোট ও বড় কৃষকদের তুলনায় বেশি হয়।

কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ

যারা নিজেদের কিছু জমি চাষ করে এবং আর কিছু জমি অন্যের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে আবাদ করে তাদেরকে বলা হয় আংশিক বর্গাচাষী।

বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন, মালিক চাষী, আংশিক বর্গাচাষী ও পুরোপুরি বর্গাচাষী। আবার খামারের আয়তনের দিক থেকে এদেরকে ছোট কৃষক, মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষক হিসাবে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে ৫০ লক্ষ ৬৫ হাজার কৃষক পরিবার রয়েছে, যারা আংশিক বা পুরোপুরিভাবে বর্গাচাষী এবং এরা সাধারণত ছোট কৃষক। বর্গাচাষীদের সংখ্যা মোট কৃষক পরিবারের ৩২ ভাগ। বাংলাদেশে পুরোপুরি বর্গাচাষীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। অর্থাৎ, এদের নিজেদের কিছু জমি আছে এবং আর কিছু জমি অন্যের কাছ থেকে বর্গা নিয়ে আবাদ করে। এদেরকে বলা হয় আংশিক বর্গাচাষী।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মোট ৮০ লাখ ৬৫ হাজার গ্রামীণ পরিবার কার্যত: ভূমিহীন। এদের মধ্যে ৬০ লাখ ৭৩ হাজার পরিবার খন্ডকালীন বা পুরোপুরিভাবে কৃষিতে মজুরি শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত আছে। কৃষির ব্যস্ত মৌসুমে এসব পরিবার কিছুটা কাজ পেলেও অন্যসময়ে তারা অর্ধবেকার বা পুরোপুরি বেকার থাকে। অবশ্য কৃষিতে সেচ-সার উফশী বীজ প্রযুক্তি প্রসারের ফলে কৃষি শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থান অনেকটা বেড়ে গেছে।

অনুশীলন (Activity) : কীভাবে জমির খণ্ডায়ন হয়? চাষাবাদে জমির খণ্ডায়নের তাৎপর্য লিখুন।

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশে জমির মালিকানায় অসম বন্টন ব্যবস্থা বিদ্যমান। ছোট কৃষকরা সংখ্যানুপাতে অনেক বেশি হলেও তাদের মালিকানায় জমির পরিমান অনেক কম। অপরদিকে, মাঝারি ও বড় কৃষকদের সংখ্যার তুলনায় তাদের জমির পরিমাণ অনেক বেশি। বড় কৃষকদের তুলনায় মাঝারি ও ছোট কৃষকদের (অবশ্য খুব ছোট কৃষকদের বাদ দিয়ে) একর প্রতি উৎপাদন বেশি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত?
- i. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর
- ii. ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর
- iii. ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর
- iv. ২ কোটি ৭৫ লক্ষ একর

খ. খামার প্রতি গড়ে প্রায় কয়টি প্লট আছে?
- i. ৮-১০ টি
- ii. ১০-১২ টি
- iii. ১২-১৪ টি
- iv. ১৪-১৫ টি

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. বড় কৃষকদের তুলনায় মাঝারী এবং ছোট কৃষকদের একর প্রতি উৎপাদন বেশি হয়।

খ. কৃষক পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগ ছোট কৃষক।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. বাংলাদেশ কৃষক পরিবারের সংখ্যা .....

খ. ছোট কৃষকের খামারের আয়তন ..... একরের কম, মাঝারী কৃষকের খামারের আয়তন ..... একর এবং বড় কৃষকের খামারের আয়তন ..... একরের বেশি।

৪। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. বাংলাদেশ কার্যত: ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কত?

খ. কী কারণে বাংলাদেশে ক্রমাগত জমির খণ্ডায়ন হচ্ছে?

পাঠ ১.৪ ভূমিস্বত্ব ও ভূমিসংস্কার

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বর্গা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ভূমি সংস্কার বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাবেন।

ভূমিস্বত্ব

কৃষি অর্থনীতিবিদ বিশপ ও টাওসেন্ট -এর ভাষায় ভূমিস্বত্ব বলতে ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব বা অধিকারকে বোঝায়। অন্য কথায়, ভূমির সাথে কৃষকের যে আইনগত ও প্রথাগত সম্পর্ক তা নির্ধারণ করে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা। প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় প্রধানত: তিন ধরনের কৃষক রয়েছে মালিক চাষী, মালিক-বর্গাচাষী (আংশিক বর্গাচাষী) এবং পূর্ন বর্গাচাষী। মালিক চাষী মালিকানা স্বত্বে নিজের জমি নিজেই আবাদ করতে পারে। বাংলাদেশে মালিক চাষীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৪০ হাজার। মালিকরা তাদের জমি নিজেরা আবাদ না করে অন্যকে বর্গা দিয়ে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বর্গাদার বর্গাসূত্রে জমিটি আবাদ করে।

'দায়শোধী' ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয়। 'খায়খালাসী' এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়, যেমন ৫ বা ৭ বছরের জন্য নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয়

অনেকে আবার উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে জমির মালিক না হয়েও বন্ধকী সূত্রে সাময়িকভাবে কোনো জমি ভোগ দখল করতে পারে। বন্ধকী ব্যবস্থা হতে পারে বিভিন্ন প্রকার। যেমন, 'দায়শোধী' ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয় এবং যতদিন পর্যন্ত বন্ধকীর টাকা বন্ধকদাতা ফেরত না দিবে ততদিন বন্ধক গ্রহীতা জমিটি ভোগ করতে থাকে। এ ধরনের বন্ধককে অনেক স্থানে 'ভোগরেহান' বা 'কটবন্ধক' বলা হয়। আরেক ধরনের বন্ধকী ব্যবস্থার নাম 'খায়খালাসী'। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময়, যেমন ৫ বা ৭ বছরের জন্য নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়া হয় এবং বন্ধক গ্রহীতা ঐ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জমিটি ভোগ দখল করার পর তা বন্ধক দাতাকে চুক্তি অনুযায়ী ফেরত দেয়।

বর্গা ব্যবস্থা

প্রায় সব দেশেই কৃষিতে কম বেশি বর্গা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও কৃষি জমি আবাদের ক্ষেত্রে বর্গা ব্যবস্থা প্রধাণত: দুই প্রকার- নগদ বা চুক্তি বর্গা ও ভাগচাষ বর্গা। নগদ বা চুক্তি বর্গা সাধারণত এক বছরের জন্য হয়। এ জন্য এ ব্যবস্থাকে অনেক স্থানে 'সনকড়ালি' বা 'বছরচুক্তি' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বছরের শুরুতেই নির্দিষ্ট নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বর্গা নিয়ে বর্গাদার সারা বছর ইচ্ছামত যে কোনো ফসলের আবাদ করতে পারে।

কোনও কোনও অঞ্চলে বর্গাদার সকল খরচ বহন করলে সে পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ও জমির মালিক পায় বাকী এক-তৃতীয়াংশ। এ ব্যবস্থাকে তেভাগা ব্যবস্থা বলা হয়।

অপর দিকে, ভাগচাষ বর্গা ব্যবস্থায় বর্গাদার সাধারণত ফসল উৎপাদনের পুরো খরচ বহন করে কিন্তু জমির মালিকের সাথে ফসল আধা আধি ভাগ করে নেয়। এ জন্য অনেক স্থানে এ ধরনের বর্গা ব্যবস্থাকে 'আধিয়া' বলা হয়। তবে, যেসব অঞ্চলে সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ শুরু হয়েছে সেখানে জমির মালিকরা বর্গাদারকে সেচ, সার, বীজ ও কীটনাশকের অর্ধেক খরচ দেয়। কোনও কোনও অঞ্চলে বর্গাদার সকল খরচ বহন করলে সে পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ও জমির মালিক পায় বাকী এক-তৃতীয়াশ। এ ব্যবস্থাকে তেভাগা ব্যবস্থা বলা হয়।

১৯৮৩/৮৪ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ২ ভাগ অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪২ হাজার পূর্ণ বর্গাচাষী এবং শতকরা ৩৬ ভাগ অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ ৬৫ হাজার আংশিক বর্গাচাষী। এদেশে বর্গাচাষীরা মোট জমির শতকরা ৪১ ভাগ আবাদ করে।

বর্গা ব্যবস্থার দুটো ক্ষতিকর দিক রয়েছে ঃ (ক) বর্গাদার কত দিন পর্যন্ত জমি চাষ করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জমির মালিকরা ইচ্ছামত বর্গদারকে পরিবর্তন করতে পারে; এবং (খ) নিজস্ব জমির তুলনায় বর্গাজমিতে উপকরণ কম ব্যবহার হয় বলে উৎপাদনও অনেক কম হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ইরি-বোরো ধান নিজের জমির তুলনায় বর্গাজমিতে একর প্রতি প্রায় ৬ মণ করে কম হয়েছে এবং রোপা আমন কম হয়েছে ৩.৫ মণ করে।

ভূমি সংস্কার কী?

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে। ভূমি সংস্কার বলতে প্রধানত: বন্টনধর্মী ভূমি সংস্কারকে বোঝানো হয়। এর আওতায় আসে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ ও উদ্বৃত্ত জমি যা সরকারের হাতে আসে তা এবং খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিতরণ করা। ভূমি সংস্কারের মধ্যে আরও পড়ে বর্গাচাষের শর্ত পরিবর্তন করা, যাতে বর্গাচাষীর উৎসাহ বাড়ে এবং তার ফলে বর্গা জমির উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি নিশ্চিতকরণ ও জমির খাজনা নির্ধারণও ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় পড়ে।

বাংলাদেশে ভূমিসংস্কারের অভিজ্ঞতা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। ১৯৫০ সনের পূর্ববাংলা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদেরকে সরাসরি জমি ভোগ দখলের অধিকার দেয়া হয়। এরপর ১৯৬০ সনে ভূমিসংস্কার আইনে পরিবার প্রতি জমির সর্বোচ্চ সিলিং ৩৭৫ বিঘা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে জমির সর্বোচ্চ সিলিং আবার ১০০ বিঘায় নামানো হয়। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশে ১০০ বিঘার সিলিং বন্যা মুক্ত এলাকায় ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। তবে, কেউ যদি এই অধ্যাদেশ জারির আগে থেকেই ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক থেকে থাকে তার বেলায় এ সিলিং কার্যকর হবে না। এই হিসাবে মাত্র ৬ লাখ একরের মত উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের জন্য সরকারের হাতে আসার কথা। তবে, সঠিক কাগজপত্রের অভাব ও ভূমি প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বাস্তবে খুব কমই উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি বর্গা সংস্কারের কোনো বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। মোট কথা, ভূমি সংস্কার কেবল কাগজেই আছে, বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

এ অধ্যাদেশে বর্গাচাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদী চুক্তির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও তে-ভাগা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যাতে জমির মালিকানার জন্য ফসলের ১ ভাগ, বর্গাদারের শ্রমের জন্য ১ ভাগ এবং উপকরণ যে সরবরাহ করবে তার জন্য ১ ভাগ থাকবে। কিন্তু, অদ্যাবধি বর্গা সংস্কারের কোনো বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। মোট কথা, ভূমি সংস্কার কেবল কাগজেই আছে, বাস্তবে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না।

অনুশীলন (Activity) : *আপনার এলাকায় কী কী বর্গা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা লিখুন। বর্গা ব্যবস্থায় কে লাভবান হয়। বাংলাদেশে বর্গাব্যবস্থায় গুরুত্ব বর্ণনা করুন।*

সারমর্ম ঃ ভূমিস্বত্ব বলতে ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব বা অধিকারকে বোঝায়। জমির সাথে কৃষকের কী সম্পর্ক তাও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়। ভূমিস্বত্ব অনুযায়ী প্রধানত: তিন ধরনের কৃষক যেমন, মালিক চাষী, মালিক-বর্গাচাষী ও বর্গাচাষী রয়েছে। বর্গা ব্যবস্থা দুই ধরনের হতে পারে, নগদ বা চুক্তি বর্গা ও ভাগচাষ বর্গা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিরাজমান ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলোর সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ভূমি সংস্কার বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।**

ক. ভূমিস্বত্ব বলতে বোঝায়–
- i. ভূমির সাথে বর্গাচাষীর সম্পর্ক
- ii. ভূমির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
- iii. ভূমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক
- iv. মালিকের সাথে বর্গাচাষীর সম্পর্ক।

খ. বর্গা ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক হচ্ছে–
- i. বর্গাদার গরীব এবং উপকরণের খরচ বহন করতে পারে না,
- ii. বর্গাদারের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান নাই,
- iii. বর্গাদার ইচ্ছামত জমি ব্যবহার করে জমির ক্ষতি করে,
- iv. বর্গাজমিতে উৎপাদন কম হয়।

২। **সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।**

ক. নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়াকে দায়শোধী ব্যবস্থা বলে।

খ. তেভাগা পদ্ধতিতে জমির মালিক পায় ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ এবং কৃষক পায় বাকী এক-তৃতীয়াংশ।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক. ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কারের অধ্যাদেশ অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করা হয় .....।

খ. ভূমি ব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলোর সমাধান কল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোকে ..... বলে।

৪। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক. বর্গা ব্যবস্থার ক্ষতিকর দিক কী?

খ. প্রচলিত ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থায় কয় ধরনের কৃষক রয়েছে এবং কী কী?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, পরিধি ও পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি কীভাবে অবদান রাখে তা আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশে জমির মালিকানা ও আবাদী জমির বন্টন আলোচনা করুন।
৪. খামার আয়তন ও খন্ডায়ন বলতে কী বোঝেন?
৫. ভূমি স্বত্ত্ব বলতে কী বোঝেন?
৬. বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের অভিজ্ঞতা কী?

উত্তরমালা - ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. iv
১। খ. iii
২। ক. মি
২। খ. স
৩। ক দুষ্প্রাপ্য
৩। খ প্রায়োগিক
৪। ক. কৃষিখাতের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধান করা
৪। খ. সম্পদের কাম্য ব্যবহার ও কৃষিপণ্যের কাম্য পরিমাণ

পাঠ ১.২

১। ক. iii
১। খ. i
২। ক. মি
২। খ. স
৩। ক. ১৮, ৫, ৪, ৩
৩। খ. শস্য, গবাদিপশু, মাৎস্য, বনায়ন
৪। ক. পাট, তুলা, চামড়া, কাঠ
৪। খ. মোট জনশক্তির ৬০%

পাঠ ১.৩

১। ক. iii
১। খ. i
২। ক. স
২। খ. মি
৩। ক. ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার
৩। খ. ২-৫, ২.৫-৭.৫, ৭.৫
৪। ক. ৮০ লক্ষ ৬৫ হাজার
৪। খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে

পাঠ ১.৪

১। ক. iii
১। খ. ii
২। ক. স
২। খ. মি
৩। ক. ১০০ বিঘা
৩। খ. ভূমি সংস্কার
৪। ক. বর্গা জমিতে উৎপাদন কম হয়
৪। খ. তিন ধরনের- মালিক চাষী, মালিক বর্গাচাষী, পূর্ণ বর্গাচাষী।